যুগান্তর

দেশপ্রেমের চশমা

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় কেমন ভিসি চাই

প্রকাশ : ১৪ জুন ২০১৯, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার

বাংলাদেশে বড় চারটি বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭৩ সালের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ-আইন দ্বারা পরিচালিত হয়।

কিন্তু বাস্তবতা পরখ করলে দেখা যায়, এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পদে পদে এ অধ্যাদেশের লঙ্ঘন হয়ে থাকে। স্খলন হয় এ অধ্যাদেশে বর্ণিত নীতি-নিয়মের।

বিশেষ করে এ অধ্যাদেশ অনুযায়ী যেভাবে ভিসি নিয়োগের বিধান আছে তা সাধারণত পালন করা হয় না। এ অধ্যাদেশ অনুযায়ী

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে স্বায়ত্তশাসন দেয়া হলেও বাস্তবতা হল যখন যে সরকার ক্ষমতায় থাকে সে সরকারই সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে কব্জায় রাখতে চায়।

ছাত্রদের রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাঝেমধ্যে সিনেট নির্বাচন দেয়া হলেও সে নির্বাচনও যথার্থভাবে অনুষ্ঠিত হয় না।

সিনেটকে সক্রিয় রাখতে হলে যেভাবে রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটদের নির্বাচন করার কথা, তা-ও করা হয় না। বড় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেট নির্বাচনের মাধ্যমে তিন সদস্যের প্যানেল নির্বাচন করে সেখান থেকে মাননীয় চ্যান্সেলরের যেভাবে একজনকে ভিসি নিয়োগ দেয়ার বিধান ১৯৭৩-এর অধ্যাদেশে আছে তার বাস্তবায়ন করা হয় না।

এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহলে কীভাবে ভিসি নিয়োগ দেয়া হয়? এ প্রক্রিয়া খুবই দুঃখজনক ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য আত্মঘাতী।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত রাজনৈতিকভাবে হয়ে থাকে। শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ থেকে শুরু করে যে কোনো পদে মনোনয়ন এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার বণ্টন হয় রাজনৈতিক বিবেচনায়।

অবশ্য বেশ অনেক বছর হল রাজনৈতিক বিবেচনার সঙ্গে আর্থিক লেনদেনের একটি বিষয় জড়িত হয়েছে। নিয়োগ, পদোন্নতি থেকে শুরু করে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার বণ্টন করা হয় ক্ষমতাসীন বর্ণদলীয় নেতাদের ইচ্ছায়।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভিসি নিয়োগ দেয়া হয় চার বছরের জন্য। নতুন ভিসি নিয়োগ পাওয়ার পর তিনি তার নিজস্ব বলয় গড়ে তোলেন। এ বলয়ে স্থান পান তার বর্ণদলীয় এবং ভিসির ঘনিষ্ঠভাজন শিক্ষকরা।

পছন্দের নতজানু লোক, যিনি কথা শুনবেন এমন লোকজনকেই প্রক্টর, প্রভোস্ট ইত্যাদি পদে নিয়োগ দেয়া হয়। এভাবে হলগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়।

ভিসিকে ঘিরে যে শিক্ষক-সিন্ডিকেট গড়ে ওঠে, যারা তাকে সবসময় বিপদে-আপদে পরামর্শ দেন, তার পাশে দাঁড়ান, তারাই আবার ভিসির মেয়াদ শেষ হওয়ার কয়েক মাস আগে থেকে তাকে উৎখাত করে কীভাকে নিজেরা ভিসি হতে পারেন সেজন্য আদাজল খেয়ে তদবির শুরু করেন।

ফলে যে কোনো সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির মেয়াদ শেষ হওয়ার কয়েক মাস আগ থেকেই নতুন ভিসি হওয়ার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। এ প্রতিযোগিতা বড় কুৎসিত।

একেকজন সম্ভাব্য প্রার্থী তার পক্ষে জোরালো তদবির চালানোর সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতাসীন ভিসি এবং তার প্রতিপক্ষ সম্ভাব্য ভিসি প্রার্থীদের দোষ খুঁজে খুঁজে বের করে সেগুলো সরকারের নীতিনির্ধারক উচ্চমহলে প্রচারের ব্যবস্থা করেন।

এসব নিয়ে আবার গণমাধ্যমে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এসব রিপোর্ট জরিপ করলে বুঝতে অসুবিধা হয় না, কোন রিপোর্টটি কার বিরুদ্ধে বা কার পক্ষে তৈরি করানো হয়েছে।

এ পরশ্রীকাতরতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে, অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসির বিরুদ্ধে বা সম্ভাব্য ভিসি প্রার্থীদের বিরুদ্ধে তাদের কুকর্মের খতিয়ানসংবলিত সচিত্র বুকলেট, লিফলেট ছড়ানো হয়। ভিসি নিয়োগের এ জঘন্য কালচার থেকে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যে কবে বের হতে পারবে তা কেউ জানে না।

তবে সরকার চাইলে খুব সহজেই এ অপসংস্কৃতি থেকে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বের করে আনতে পারে। সময়মতো নির্বাচনের মাধ্যমে সিনেটকে সক্রিয় করে সিনেট সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত তিন সদস্যের প্যানেল থেকে ভিসি নির্বাচনের ধারাবাহিক সংস্কৃতি চালু করলে এ অপসংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসা অসম্ভব নয়। কিন্তু সরকার সেরকম ঝুঁকি নিতে চায় না। কারণ, সিনেট সদস্যরা যদি ভোট দিয়ে কম নতজানু শিক্ষকদের অথবা বিরোধী পক্ষের শিক্ষকদের নির্বাচিত করেন তাহলে সরকারকে তো ওই নির্বাচিত তালিকার মধ্য থেকেই ভিসি নিয়োগ দিতে হবে। সরকার এমন 'অপছন্দের' কাজ করতে চায় না। যে সরকারই ক্ষমতায় থাকে, সে সরকারই চায় ভিসি হবেন নতজানু লোক। তিনি সবসময় সরকারের গুণকীর্তন করবেন। নাম উল্লেখ না করেই বলা যায়, বিভিন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিদের কার্যকলাপ পর্যালোচনা করলে সরকারি ইচ্ছার বাস্তবায়ন লক্ষ করা যায়।

তবে আর যাই হোক, একাডেমিক ও প্রশাসনিক যোগ্যতাকে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হওয়ার যোগ্যতা হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। এখানে কে কতটা সরকারের ঘনিষ্ঠভাজন সেটা প্রমাণের মধ্য দিয়ে ভিসি হওয়ার প্রতিযোগিতা গতি পায়। এ প্রতিযোগিতায় জড়িত হয়ে পড়েন ক্ষমতাসীন দলের নেতা, সংসদ সদস্য এবং মন্ত্রীরাও। আর তীব্র তদবির প্রতিযোগিতায় জুতার শুকতলি ক্ষয় করে এভাবে যারা ভিসির গদিতে আসীন হন তাদের পক্ষে ক্ষমতায় থাকাকালে তিনি যাদের সমর্থন নিয়ে ক্ষমতাসীন হয়েছেন তাদের অনুরোধ

রক্ষা না করে উপায় থাকে না। এ প্রক্রিয়া চালু থাকায় শিক্ষক নিয়োগকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে অযোগ্য প্রার্থীরা শিক্ষকতার চাকরিতে ঢুকে পড়েন। অযোগ্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকরি হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সুশাসন আর লেখাপড়ার মান ধসে পড়ে।

এ প্রক্রিয়া চলতে থাকলে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সুশাসন ও মানের আরও অবনমন হবে। এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সরকারের উচিত হবে ১৯৭৩ সালের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ আইন মেনে ভিসি নিয়োগ দেয়া।

আর তা না পারলে এ অধ্যাদেশকে যুগোপযোগী করে সে বিধান অনুযায়ী ভিসি নিয়োগের ব্যবস্থা করা। সরকারকে মনে রাখতে হবে, একজন ভিসি হলেন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক এবং প্রশাসনিক প্রধান।

তিনি যদি যোগ্য ব্যক্তিত্ব না হন, বিশ্ববিদ্যালয়কে দেশে-বিদেশে প্রতিনিধিত্ব করার মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন না হন, তাহলে তার পক্ষে একজন ভালো ভিসি হওয়া সম্ভব হবে না।

অতি সম্প্রতি ২/১ দিনের মধ্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভিসির চার বছরের মেয়াদ শেষ হতে যাচ্ছে। এখানে সরকার কাউকে-না-কাউকে ভিসি নিয়োগ দেবে। কিন্তু এ প্রক্রিয়ায় যে কাদা ছোড়াছুড়ি লক্ষ করা যাচ্ছে তা অত্যন্ত দুঃখজনক ও সম্মানহানিকর।

আমি শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ইউজিসিকে এ মর্মে পরামর্শ দিতে চাই, আপনারা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশকে সমুন্নত রেখে ভিসি নিয়োগ দিন। নিয়মিত সিনেট নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করুন। রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট নির্বাচন দিন। আর তা যদি না পারেন তাহলে এ অধ্যাদেশকে যুগোপযোগী করার জন্য সংস্কার করুন।

আর তা-ও যদি না পারেন, তাহলে ভিসি নিয়োগ দেয়ার জন্য বিজ্ঞাপন দিয়ে সম্ভাব্য প্রার্থীদের ডেকে একটি শক্তিশালী বোর্ডের সামনে হাজির করে তাদের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করুন।

তাদের একাডেমিক ও প্রশাসনিক যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতা যাচাই করুন। নতজানু লোক না খুঁজে যোগ্য লোককে যোগ্য পদে বসানোর নীতি অনুসরণ করুন। শিক্ষাগত ও প্রশাসনিক যোগ্যতাকে প্রাধান্য দিয়ে এমনভাবে ভিসি মনোনয়ন দিলে সেসব ভিসি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ধসে পড়া ভাবমূর্তি উদ্ধারে চেষ্টা করতে পারবেন।

সম্প্রতি দুঃখের সঙ্গ লক্ষ করছি, বিশ্ববিদ্যালয়ে দিন দিন পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে জায়গা করে নিচ্ছে জলকামান। বিশ্ববিদ্যালয় তো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নয়। বিশ্ববিদ্যালয় হল একটি একাডেমিক প্রতিষ্ঠান। এখানে তো জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা হবে। ক্যাম্পাসে জলকামান থাকবে কেন? কামানের জায়গা তো যুদ্ধক্ষেত্র। কামান থাকবে তো ক্যান্টনমেন্টে। যুদ্ধের ময়দানে। তাহলে কি আমরা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করেছি? আমরা এমনই ভিসি নিয়োগ দিচ্ছি যাকে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় পুলিশের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। ক্যাম্পাসের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে জলকামানের ব্যবহার করতে হচ্ছে!

আমরা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এমন ভিসি চাই, যারা নিজের প্রজ্ঞা ও মেধা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় চালাতে সক্ষম। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনকে সমুন্নত রাখতে বদ্ধপরিকর। মেধাভিত্তিক নিয়োগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম। সরকারি ডিকটেশন অনুযায়ী কাজ না করে নিজের ব্যক্তিত্ব সমুন্নত রেখে স্বাধীনভাবে বিশ্ববিদ্যালয় চালাতে পারঙ্গম। ভিসি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের সংস্কৃতি চালু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক ভাবমূর্তি কমিয়ে এর একাডেমিক ইমেজ বৃদ্ধি করবেন। একাডেমিক ক্যালেন্ডার চালু রাখবেন। শিক্ষকদের মধ্যে বর্ণদলভিত্তিক দ্বন্দ্ব-ফ্যাসাদ কমিয়ে তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও একাডেমিক প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করবেন। সর্বোপরি লেখাপড়া যাতে করে সার্টিফিকেটসর্বস্ব না হয়, সে জন্য গ্র্যাজুয়েটদের মান বাড়াতে সচেষ্ট হবেন। কেমন ব্যক্তিকে ভিসি হিসেবে নিয়োগ দিলে এসব লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে, তা সরকার খুব ভালোভাবেই জানে। সরকারের কাছে সব শিক্ষকের বিস্তারিত তথ্য আছে। সরকারের যদি সদিচ্ছা থাকে, তাহলে সুযোগ্য, সাহসী ও একাডেমিক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শিক্ষককে ভিসি নিয়োগ দিয়ে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর হারানো ইমেজ পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে নাগরিক সমাজে প্রশংসিত হতে পারে।

ড. মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার : অধ্যাপক, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

akhtermy@gmail.com